PRINT

সমকাল

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে যা জরুরি

উচ্চশিক্ষা

১১ ঘণ্টা আগে

কাজী মসিউর রহমান

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো সমাজের আরোগ্য নিকেতন। সমাজে ছড়িয়ে পড়া অসুখের কী প্রতিষেধক থাকতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তা বোঝার জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয়' ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মূলত একটি বিমূর্ত প্রতিষ্ঠান, যাকে জড়িয়ে থাকে মূর্ত নানা উপকরণ। যেমন- শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রশাসন, ভৌগোলিক এলাকা, আড়াআড়ি বা খাড়াখাড়ি বিস্তৃত ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদি। কিন্তু এসব বিষয়ের গভীরে অদৃশ্য জ্যার মতো একটি আত্মা থাকে। যাকে পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে চিহ্নিত করা না গেলেও সংবেদনশীল চৈতন্য দিয়ে বেশ অনুভব করা যায়। ওই আত্মাটিই সমস্ত জাহিরি উপকরণের ভেতর দিয়ে একটি সুললিত সুর তৈরি করে গড়ে তোলে বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিমূর্ত সত্তাটিকে কিন্তু আশ্রয় নিতে হয় বিস্তৃত আর নিবিড় কোনো প্রাকৃতিক পরিসরে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, প্রতিবেশের সঙ্গে মানুষের রয়েছে এক বর্ণাঢ্য বন্ধুত্ব। যদি পরিবেশ হৃদয়গ্রাহী হয়, সেখান থেকে পাওয়া যায় ইতিবাচক আবেগের প্রবহ, প্রাণোচ্ছ্বাস আর সততা নির্মাণের নির্মল প্রেরণা। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে অন্যান্য সৃষ্টির এবং মহাজাগতিক আবহের মাঝে এক গভীর সখ্য সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। চাপমুক্ত এ রকম পরিসরে চৈতন্য তীব্রতর বিকশিত হতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশ কাঠামো স্বাস্থ্যকর ও আধ্যাত্মিক হয়ে উঠলে শিক্ষার্থীর চিন্তাচেতনায় আরও বোধগত উন্মেষ ঘটে, আচরণে ইতিবাচকতা নির্মিত হয়, সামাজিকতার আঙ্গিক ও বহুমাত্রিকতার বিবেচনা বিকশিত হয়, যোগাযোগ দক্ষতা হয়ে ওঠে পরিশীলিত, কাঙ্ক্ষিত আবেগের স্ফুরণ ঘটে এবং মস্তিস্কের মটর-নিউরন বেশি সক্রিয় হয়। অর্জিত জ্ঞানের গাজন আর প্রতিফলন হতে পারে বিশুদ্ধ প্রকৃতিতেই। জন্মের পর থেকে অসীম রহস্যময় মানুষ এক ধরনের পূর্ণতার অভিপ্রায় নিয়ে বড় হতে থাকে। এই পরিপূর্ণতার স্বপ্নতীর ধরে চলতে গিয়ে ব্যক্তি মূলত আবিস্কার করতে চায়, চায় অতলস্পর্শী অজানায় পৌঁছতে, বিশ্লেষণ-সমালোচনা আর মূল্যায়ন করতে চায়, চায় নিজেকে ইচ্ছামতো প্রকাশ করতে বা লুকাতে, আবার কখনওবা ঝোঁকে

বোধ-বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটাতে, ইচ্ছামতো সৃষ্টি করতে, নির্মাণ করতে, সংস্কৃতিকে সাজাতে, অভিনিবেশ জলে ডুব দিতে, বিশ্ববীক্ষা তৈরি করতে এবং সমাজ বদলাতে।

সভ্যতার একটি বড় দায়িত্ব ব্যক্তির বিকেশের পথ মসৃণ করা। তাই তার মানচিত্রে ঠাঁই নেওয়া রাষ্ট্রগুলোকে এমন উদ্যোগ নিতে হয়, যাতে দুয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছাগুলো কিছুটা হলেও পূরণ হতে পারে। এই দায়িত্ববোধের সূত্র ধরেই বিকশিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ ক্ষমতা-উপাসক রাষ্ট্রগুলো খুশি মনে এ রকম স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে চায় না প্রথমে। পৃথিবীর যেসব ভূখণ্ডে 'মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়' সৃষ্টি করা গেছে, তা প্রধানত শিক্ষার্থীদেরই আন্দোলনের ফসল। ওদিকে মানুষের ইতিবাচক পরিস্ফুটনের পথে প্রায়শই সীমাহীন বিপত্তি ছড়িয়ে থাকে। স্বজনতোষী পুঁজিবাদী সমাজে, উদাহরণ দিতে গিয়ে, প্রতিবন্ধকতার নির্যাস হিসেবে নিদেনপক্ষে ক্ষমতা আর সম্পদের পুঞ্জীভবনের কথা বলা যায়। তাই জন্মের পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতা-সম্পদের সমতাভিত্তিক বণ্টনের কাজে নেমে পড়তে হয়। সে বিবেচনা থেকে কেরালা মডেল পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, অর্থনীতির খ্যাতিমান অধ্যাপক ও জনবুদ্ধিজীবী প্রভাত পাটনায়েক বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। এই বিপ্লবী শব্দটি আবার কারও কারও কাছে খুবই আতঙ্কের। কেননা প্রকৃত মাত্রায় গণতান্ত্রিক বণ্টনের কথা উঠলেই আধিপত্যবাদীরা বিপন্ন বোধ করেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারকামীদের বিরুদ্ধে তারা 'বাম' বা 'কমিউনিস্ট' শব্দবোমা ব্যবহার করেন খুব চাতুর্য নিয়ে। শুধু তারা নন, সঙ্গে যুক্ত হন অবিকশিত জাতীয় বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত। এই মধ্যবিত্তের কাছে কিন্তু জ্ঞান, মননশীলতা, সন্ত্রাস, শাসন, তোষণ খুবই উপযোগী। বলতে দ্বিধা নেই, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেকেই আজ এই শ্রেণিতে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে গেলে নির্মোহ সমালোচনা আর সত্যজ্ঞান অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাকে দায়িত্ব অব্যাহত রাখতে হয়। এদিকে জ্ঞান আর সত্যের মাঝে কিন্তু নিবিড় একটি সম্পর্ক আছে। যা 'সত্য' নয় তা জ্ঞান হতে পারে না। আবার 'সত্য' চলাফেরার জন্য, উদ্ঘাটিত হওয়ার জন্য নিজস্ব পথ-পদ্ধতি অনুসরণ করে। সত্য তুলে ধরার প্রয়োজনীয় শর্তগুলো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিশ্চিত করতে পারে আধিপত্য রেখার বাইরে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। সাধারণ একজন

পেশাজীবী বা কৃষক বা মোটর মিস্ত্রিও কিন্তু জ্ঞান সৃজন করেন। কিন্তু 'সত্য' আবিস্কারের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় তার সব আয়োজন নিয়ে ইতিমধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞানের সঙ্গে নিরন্তর চালিয়ে যায় সমালোচনা-দ্বান্দ্বিকতার দ্বৈরথ। তাই অন্যান্য দক্ষ প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্যটা প্রধানত এখানেই রচিত হয়। ভীতি-আড়ষ্টতার ভেতর, দুর্নীতি আর অযোগ্যতার ছায়াতলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবিষ্ট জ্ঞান-সাধনা সম্ভব নয়।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সত্যমুখী জ্ঞান কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ছড়াতে পারছে না। যেটুকু এখনও তৈরি হচ্ছে তা সিংহভাগই পশ্চিমা ও দেশীয় ক্ষমতার তোষণমূলক। আন্তঃশাস্ত্রীয় তো নয়ই, বরং সেগুলো একমাত্রিক বা খণ্ডিত জ্ঞান, যা প্রায়ই আবার শিক্ষকবৃন্দের পদোন্নতির যোগ্যতা তিলক। কেন এমন হলো বিশ্ববিদ্যালয় তার নিরানব্বইটা কারণ উলেল্গখ করা যায়। পাঠকের কাছে সেগুলো কিছুই আজ গোপন নয়। কিন্তু এই বন্ধ্যা সময়ের কানাগলিতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন হলো, সমাধান কী করে সম্ভব?

সমাধানের দিকে ইঙ্গিত রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক পরিচয়টি সামনে আনা দরকার। সমাজের মধ্যে যেমন সে জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে, তেমনি তার কাজ হলো মানুষের মুক্তির প্রসঙ্গকে প্রধান রেখে সমাজকে দিকনির্দেশনা দেওয়া। সমাজ আর বিশ্ববিদ্যালয় দুটিই যখন আক্রান্ত হয়, তখন এ দু'পক্ষের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি নতুন করে নির্মিত হওয়া প্রয়োজন পড়ে। আক্রান্ত সমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে দাঁড়াতে হয় সরকারকে একাগ্রতা নিয়ে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম আর বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের আরোগ্যনিকেতন হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে জনমত তৈরি করতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় হবে জ্ঞানী আর নিবিষ্ট সত্য-সাধকদের জন্য। শুধু চাকরি বাজারের জন্য দক্ষ শ্রমিক তৈরির দায়িত্ব দিলে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে 'বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে চিহ্নিত সাধারণ নামটি বেমানান হয়ে উঠবে। বিশ্ববিদ্যালয় গুণবাচকতাকে বোঝায়। সংখ্যায় বিকোলে ওই শব্দটির প্রতি নিষ্ঠুর অবিচার করা হবে। যেমনটা হয়েছে, আরও হতে চলেছে এই বাংলাদেশে। প্রত্যেক জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় বসানোর দরকার কী? বাজারে দক্ষতা সৃষ্টিতে সক্ষম বিশ্বমানের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যাক। সংখ্যার দোহাই দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহণযোগ্য মান তৈরিতে ব্যর্থ হলে ২০২১ এবং ২০৪১-এর বাংলাদেশের জন্য কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্ব কীভাবে তৈরি হবে? কারণ বিশ্ববিদ্যালয় পঙ্গু হলে মুখ্যত ক্ষতিগ্রস্ত হবে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে দলকানা রাজনীতি নিরুৎসাহিত করতে হবে নিষ্ঠতা নিয়ে। শুরুতেই সরকারের প্রধান কাজ হবে উপাচার্য নিয়োগে দল নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়া। প্রকৃত শিক্ষাবিদ, সৎ, সাহসী ও মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, এমন ব্যক্তিকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কাঠামো ও সংস্কৃতিগত আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। কেননা মাথায় পচন থাকলে আর কোনো আয়োজনই অর্থবহ হয় না।

সত্যসন্ধানী আর মুক্তিকামী বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাবিদদের নিয়ে স্বাধীন ও ন্যায়ানুগ রেগুলেটরি কমিশন গঠন করতে হবে, যাতে করে সংশ্লিষ্ট সবার জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়। নতুন-পুরনো সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রিজেন্ট বোর্ডে সদস্য হিসেবে শিক্ষাবিদদের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-শিক্ষকসহ সবাইকে কার্যকরী কর্মসূচি নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বোঝাতে হবে। আর এভাবেই একটু একটু করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাজ করবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা আর সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য।

mosiurrahman1971@gmail.com

শিক্ষক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গোপালগঞ্জ

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com